তোত্তোচান

জানালার ধারে ছোট্ট মেয়েটি

মূল

তেৎসুকো কুরোয়ানাগি

অনুবাদ

চৈতী রহমান

প্রকাশন

তোত্তোচান : জানালার ধারে ছোট্ট মেয়েটি
মূল: তেৎসুকো কুরোয়ানাগি
অনুবাদ: চৈতী রহমান
[ডরোথি ব্রিটন কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় অনূদিত
'তোত্তোচান : দ্য লিটল গার্ল অ্যাট দ্য উইন্ডো' সংস্করণ থেকে]

প্রকাশক: দ্যু প্রকাশন
১৯তম মুদ্রণ: অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ডিসেম্বর ২০২৪
১৮তম মুদ্রণ: আষাঢ় ১৪৩১, জুলাই ২০২৪; ১৭তম মুদ্রণ: পৌষ ১৪৩০, জানুয়ারি ২০২৪
১৬তম মুদ্রণ: ভাদ্র ১৪৩০, আগস্ট ২০২৩; ১৫তম মুদ্রণ: চৈত্র ১৪২৯, এপ্রিল ২০২৩
১৪তম মুদ্রণ: ফাল্গুন ১৪২৯, মার্চ ২০২৩; ১৩তম মুদ্রণ: ফাল্গুন ১৪২৯, ফেব্রুয়ারি ২০২৩
১২তম মুদ্রণ: অগ্রহায়ণ ১৪২৯, ডিসেম্বর ২০২২; ১১তম মুদ্রণ: আশ্বিন ১৪২৯, অক্টোবর ২০২২
১০ম মুদ্রণ: জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯, মে ২০২২; ৯ম মুদ্রণ: ফাল্গুন ১৪২৮, ফেব্রুয়ারি ২০২২
৮ম মুদ্রণ: আশ্বিন ১৪২৮, অক্টোবর ২০২১; ৭ম মুদ্রণ: ভাদ্র ১৪২৮, আগস্ট ২০২১
৬ষ্ঠ মুদ্রণ: শ্রাবণ ১৪২৮, জুলাই ২০২১; ৫ম মুদ্রণ: পৌষ ১৪২৭, ডিসেম্বর ২০২০
৪র্থ মুদ্রণ: ভাদ্র ১৪২৭, আগস্ট ২০২০; ৩য় মুদ্রণ: ফাল্গুন ১৪২৬, ফেব্রুয়ারি ২০২০
দ্বিতীয় সংস্করণ: আষাঢ় ১৪২৬, জুন ২০১৯; প্রথম প্রকাশ: কার্তিক ১৪২৫, নভেম্বর ২০১৮
প্রথম জাপানি প্রকাশ: ১৯৮১, কোদানশা পাবলিশার্স লি., টোকিও

Totto-chan : The Little Girl At The Window
by Tetsuko Kuroyanagi
Translated by Chaity Rahman
[From English by Dorothy Britton, Kodansha Publishers Ltd, Tokyo, 1984]

First Japanese Published: 1981, Kodansha Publishers Ltd., Tokyo
First Published: November 2018, Second Edition: June 2019
3rd Print: February 2020; 4th Print: August 2020; 5th Print: December 2020
6th Print: July 2021; 7th Print: August 2021; 8th Print: October 2021
9th Print: February 2022, 10th Print: May 2022; 11th Print: October 2022
12th Print: December 2022; 13th Print: February 2023; 14th Print: March 2023
15th Print: April 2023, 16th Print: August 2023, 17th Print: January 2024
18th Print: July 2024, 19th Print: December 2024 by Dyu Publication
www.dyu.com.bd
ISBN (Hardback): 978-984-96539-4-3
ISBN (Paperback): 978-984-96334-7-1
Printed & Bound in Bangladesh

অনুবাদকের
উৎসর্গপত্র

পথের পাঁচালীর সেই ছোট্ট শিশু অপুকে—

যার ঘরে প্রায়ই পরদিন সকালে খাওয়ার মতো কিছু থাকত না। ঘরের চালা ফুটোফাটা হয়ে বৃষ্টির জল পড়ত। দারিদ্র্য-দুঃখকষ্ট ছিল নিত্য ঘটনা। এরমধ্যে জন্মে সে দেখতে পেয়েছিল আনন্দধারা বহিছে ভুবনে, চারপাশ থেকে শুষে নিতে শিখেছিল আনন্দ। ছোট ছোট ঘটনায় সুখি হওয়া শিখেছিল সে, অহেতুক হা-হুতাশে নিজের জীবন অপচয় করেনি। মুগ্ধ পর্যটক হয়ে সে যাপন করেছিল নিজের জীবনটা; যে জীবনে দুঃখ, শোক, আনন্দ, বেদনা, ভালোবাসা সব অনুভূতি পাশাপাশি বাস করে। এবং হাতে তুলে নিয়েছিল বই। শিক্ষা তার জীবন থেকে দূর করেছিল সব অন্ধকার।

মুখপাত

'মানবসভ্যতার মহত্তম আবিষ্কারের নাম ভালোবাসা।'
—দ্বিজেন শর্মা

আমাদের অতি পরিচিত একজন শিশু অপু। বাড়ি তার নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে। পৌষ মাসের এক সকালে অপু লেপ মুড়ি দিয়ে রোদ উঠবার অপেক্ষা করতে করতে মায়ের মুখে পাঠশালার নাম শুনল। মা বলছেন আজ তার পাঠশালায় যেতে হবে। সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না! অপুর ধারণা ছিল যে যারা দুষ্টু ছেলে, মায়ের কথা শোনে না, ভাইবোনদের সঙ্গে মারামারি করে, শুধু তাদেরই পাঠশালায় পাঠানো হয়ে থাকে। সে তো কক্ষনো এরকম করে না, তবে তার কেন পাঠশালায় যেতে হবে?

অপুর যাওয়ার কথা ছিল গ্রামের প্রসন্ন গুরুমশাইয়ের পাঠশালায়। যেখানে মুদি দোকান চালাতে চালাতে, খদ্দেরকে তেল নুন মেপে দিতে দিতে রাগী রাগী গলায় তিনি ছেলেদের পড়ান। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না। এই বেতের উপর অভিভাবকদেরও বিশ্বাস গুরুমশাইয়ের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। তারা বলতেন, ছেলেদের যাতে পা খোঁড়া আর চোখ কানা না হয়, এটুকু খেয়াল রেখে গুরুমশাই যত ইচ্ছা বেত চালাতে পারেন। গুরুমশাই তার শিক্ষাদানের উপযুক্ত ক্ষমতা ও উপকরণের অভাব একমাত্র বেতের সাহায্যে পূর্ণ করবার চেষ্টায় এমন বেপরোয়া বেত চালাতে থাকেন যে তার ছাত্ররা পা খোঁড়া ও চোখ কানা হবার দুর্ঘটনা থেকে কোনোমতে প্রাণে বেঁচে যায় মাত্র।

অপু বিভূতিভূষণের উপন্যাসের চরিত্র হলেও আমাদের সবার খুব কাছের একজন জানাশোনা মানুষ সে, তার জীবনের বহু গল্প আমরা জানি। অপু বই পড়তে খুউব ভালোবাসত। নিজের বাড়িতে পড়ে থাকা পুরনো পুঁথি থেকে শুরু করে প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে ধার করা বই, পত্রপত্রিকা, বাবার হিসেবপত্তর, বিজ্ঞাপনের কাগজ...যা পেত সামনে তাই-ই পড়ে ফেলত সে। বইপত্র পড়ে নিত্যনতুন সব কাজের কি অকাজের কতকিছু জানা যেত! যেমন ধরা যাক, শকুনির ডিমে পারদ পুরে মুখের ভেতরে রাখলে আকাশে ওড়া যায়...এই অসাধারণ জ্ঞানটি সে লাভ করেছিল অতি আগ্রহে নিজে নিজে পুরনো বাক্সপ্যাঁটরা ঘেঁটে জরাজীর্ণ পুরনো ঝুরঝুরে বইপত্র পড়ে ফেলার অভ্যাস থাকায়। তবে কিনা ওভাবে আকাশে ওড়া গেলে তো কেউ আর হেঁটেচলে এদিক ওদিক যেত না, উড়েই যেত বটে!... যে শিশুর এতখানি পড়ার আকাঙ্ক্ষা, মায়ের মুখে পাঠশালায় পড়তে যাবার কথা শুনেই সে ভয় পেয়ে গেল।

আমাদের আরেক পরিচিত শিশু রবি। সে বাস করত মস্ত শহর কলকাতায়। ভাইবোনেরা তার চাইতে বয়সে অনেক বড় ছিল তাই সে তাদের কাউকে খেলার সাথী হিসেবে পায়নি। বাবা ঘুরে বেড়াতেন বাড়ি থেকে দূরে পাহাড়ে পাহাড়ে, মা ছিলেন দুরারোগ্য অসুখে শয্যাশায়ী তাই মায়ের কাছে যাওয়াও বারণ ছিল শিশুটির। মস্ত বাড়িতে অনেক অনেক লোকজনের ভিড়ে কতক একা একাই সে বড়ো হচ্ছিল। ঘড়ির কাঁটার নিয়মে বেঁধে দেওয়া জীবন ছিল তার। রবি ছিল মোটের ওপর খুবই চুপচাপ শান্ত স্বভাবের ভাবুক এক শিশু, কাউকে সে বিশেষ জ্বালাতন করত না। কিন্তু কেন জানি সে খুবই জ্বালাতন শুরু করত মাস্টার মশাই পড়াতে এলে! মোটেই মাস্টার মশাইয়ের কাছে পড়া করতে চাইত না সে। মাস্টারকে নিয়মিত ফাঁকি দেবার এক্কেবারে পোক্ত দুটি উপায় ছিল তার—মাথাব্যথা করছে আর পেট কামড়াচ্ছে। দুটোই বাইরে থেকে দেখে বোঝবার উপায় নেই। সে কিন্তু কক্ষনো বলত না যে জ্বর এসেছে, কারণ সে ঠিক জানত জ্বর এসেছে বললে যদি গা-গরম না করে তাহলে অজুহাতটি ধোপে টিকবে না। সে যুগে ইশকুলের মাস্টারদের বিশ্বাস ছিল পিটুনি না দিলে ছাত্রদের মগজে কিচ্ছু ঢুকবে না। পিটুনির ভয়েই সে এইসব নানা বাহানা নিয়ে অসুস্থ মায়ের কাছে গিয়ে লুকোত। পেট

ভাঙা বেঞ্চি, পড়ো দেয়াল, ফুটোফাটা ঘরের ছাদ, অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার নিরানন্দ ক্লাশঘর নিয়ে সরকারি সাহায্যের আশায় ধুঁকে চলেছে। সরকারি সাহায্য ক্ষমতাসীনদের হাত ঘুরে এসে ইশকুলের তেমন দৃশ্যমান বা গুণগত উন্নয়ন ঘটাচ্ছে না। সাধারণ এলাকাবাসী, ধনাঢ্য ব্যক্তি কিংবা বিদেশে থাকা ব্যক্তিরা ধর্মালয়কে যতটা গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়ন করছে ঠিক ততটাই অবহেলা দেখাচ্ছে শিশুদের ইশকুলকে। এমনও ঘটে অহরহ, দূর দূর সব গ্রামে ফসল কাটার পরে ইশকুলের দুর্বৃত্ত প্রধানশিক্ষকরা কিংবা ইশকুল কর্তৃপক্ষ মোটা চাঁদা দাবি করে শিশুদের পরিবারের কাছে, পরীক্ষায় বসতে না দেওয়ার হুমকি দেয়। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো শিশুদের পাঠ্যপুস্তকগুলোকে দিন দিন বিজ্ঞানমনস্কতা থেকে সরিয়ে পশ্চাৎপদ ও সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট করা হচ্ছে উচ্চশিক্ষিত লোকেদের মদতেই, এতে শিশুর নিজে নিজে বই পড়ে ভালো কিছু শেখার সুযোগও কমে আসছে। শিশুদের শিক্ষা নিয়ে ক্ষমতাসীনদের, উচ্চশিক্ষিত লোকেদের এবং সাধারণ মানুষের যৌথভাবে চর্চিত অন্ধকার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এই ভূখণ্ডের এক তেতো সত্য। আমাদের দেশের শিশুরা বড়োমানুষদের এই দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির কাছে একেবারেই অসহায়। তারা 'মানুষ' হচ্ছে এইসব দুর্বৃত্ত বড়োমানুষদের হাতেই। আমরা আমাদের শিশুদের ঠকাচ্ছি। দুর্বৃত্তায়িত শিক্ষাব্যবস্থা কক্ষনো একটা দেশে মানবিক পরিবর্তন ঘটতে দেবে না। একটা দেশের মানবিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব বহুদিন ধরে মানবিক শিক্ষাব্যবস্থার চর্চা অব্যাহত রাখা গেলে। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে বদলাতেই হবে।

সত্যিকার অর্থে তোত্তোচানের এই বইটি বড়োমানুষদের পড়া উচিত, পড়া উচিত বাপ-মায়েদের। এই বইয়ে একটা জিনিস কিন্তু স্পষ্ট, তা হলো শিশুকে আনন্দময় শৈশব কাটাতে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে ইশকুলগুলোকেই। শিশু তার শৈশব ইশকুলে নিয়ে আসবে, বাড়িতে রেখে আসবে না, এমন ইশকুল দরকার শিশুর জন্য। ওরকম ইশকুল কল্পনা করা খুব সোজা। কেবল শিশুর মতন সরল করে ভাবতে হবে বড়োমানুষদের, বাপ-মায়েদের। বড়োমানুষদের বুঝতে হবে যে শিশুরা কক্ষনো অর্ধেক-মানুষ নয়, তারা পূর্ণাঙ্গ মানুষ। বাপ-মায়েদের

বুঝতে হবে যে শিশু কেবল উত্তরাধিকারী হবার জন্যে জন্মায় না, তারা মানুষ হবার জন্য জন্মায়।

আমরা এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে পারি যে শিক্ষাব্যবস্থায় বড়ো হওয়া শিশুরা বড়োমানুষ হয়ে যাবার পরেও তাদের শিশুকালকে ভুলবে না, তাই তারা অন্য শিশুদের মনটাও বুঝতে পারবে। সেই শিক্ষাব্যবস্থা শিশুদের এমনভাবে 'মানুষ করবে' যে মানবশিশুরা তাদের চারপাশের প্রাণমণ্ডলকে ভালোবাসতে শিখবে, কোনোরকম শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতিতে না ভুগে নিজেদেরকেও সেই প্রাণমণ্ডলের ক্ষুদ্র সদস্য মনে করবে। সেই শিশুরা মানবসমাজের মানবিক পরিবর্তন আনবে।

পৃথিবীর যেখানেই আমরা যাই, যে দেশেই আমরা বাস করি, একই সূর্য আমাদের আলো দেখায়, একইরকম ভালোবাসা-দুঃখ-কষ্ট-স্নেহমমতার অনুভূতি আমাদের মনে দোলা দেয়। সূর্যকে ভাগ করা যায় না। শিক্ষা নামের সূর্য পৃথিবীর প্রত্যেক শিশুর চোখে যাতে একই আলো এনে দিতে পারে সেইরকম এক মানবিক শিক্ষাব্যবস্থার স্বপ্ন আমাদের দেখা উচিত।

শিশুদের শৈশব হোক আনন্দময়।

চৈতী রহমান
to.chaityrahman@gmail.com

রেল ইস্টিশন ৩৩
জানালার ধারে তোত্তোচান ৩৬
নতুন ইশকুল ৪১
আহ্! দারুণ ইশকুল! ৪৩
প্রধানশিক্ষক ৪৫
টিফিনের ঘণ্টা ৫০
তোত্তোচানের ইশকুল শুরু ৫২
রেলগাড়ি ক্লাশঘর ৫৫
ইশকুলের পড়ালেখা ৫৭
সমুদ্দুরের কিছু আর পাহাড় থেকে কিছু ৬১
ভালো করে চিবিয়ে খাও ৬৫
হাঁটাহাঁটি ঘোরাঘুরি ৬৭
বিদ্যালয়-সংগীত ৭১
ফের জায়গা মতন রাখ ৭৪
তোত্তোচানের নাম কী? ৭৮
রেডিওতে হাস্যকৌতুক ৭৯
নতুন রেলগাড়ি আসবে ৮১
সাঁতারের পুকুর মজার দুপুর ৮৬
রিপোর্ট কার্ড ৮৯
গ্রীষ্মের ছুটি ৯০
বিরাট অ্যাডভেঞ্চার ৯৩
কে কত সাহসী? ৯৮
রিহার্সাল-হল ১০১
উষ্ণ প্রস্রবণে ভ্রমণ ১০৪
ইউরিদমিক্স ১০৯
এইটাই আমার চাই! চাই! চাই! ১১৫
ওদের সবচেয়ে খারাপ পোশাক ১১৯
তাকাহাশি ১২২
দেখেশুনে লাফ মারো ১২৫

আর...তারপর? ১২৭
আমরা শুধু খেলছিলাম তো! ১৩১
বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৩৪
কবি কোবাইয়াশি ইসসা ১৪০
বড়ই রহস্যময় ঘটনা ১৪৩
হাত দিয়ে কথা বলা ১৪৬
মারুইয়ামা মশাই ও সাতচল্লিশ জন রনিন ১৪৮
মাসো...চা...ন ১৫১
শখের বেণী দুটো ১৫৪
'থ্যাংক ইউ' ১৫৭
পাঠাগার কামরা ১৬০
লেজ ১৬৪
তোমোয়ে ইশকুলে দ্বিতীয় বছর ১৬৮
রাজহংসের হ্রদ ১৭১
মাঠের শিক্ষক ১৭৪
মাঠের রান্নাঘর ১৭৮
তুমি সত্যি সত্যি ভালো মেয়ে ১৮২
বউ ১৮৫
ভাঙাচোরা ঝুরঝুরে ইশকুল ১৮৭
চুলের ফিতে ১৯০
আহতদের দেখতে যাওয়া ১৯৩
স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাকল ১৯৭
ইংরেজি বলা ছেলে ২০৩
নাটক ২০৭
চক ২১০
ইয়াসুয়াকিচান মারা গিয়েছে ২১২
গুপ্তচর ২১৫
বাবার বেহালা ২১৮
কথা দাও! ২২১
রকি কোথায় যেন চলে গেল! ২২৪
টি-পার্টি ২২৮
সাইয়োনারা, সাইয়োনারা! বিদায়, বিদায়! ২৩২
পরিশিষ্ট ২৩৫

রেল ইস্টিশন

নামল তারা রেলগাড়ির কামরা থেকে। মা আর তোত্তোচান। ইস্টিশনের নাম জিয়ুগাউকা। ওইমাচি লাইনের ট্রেনে চেপে তারা এদ্দূর এসেছে। তোত্তোচানের হাতটি ধরে মা টিকেট দেখানোর দরোজার দিকে এগুলেন। দরোজায় দাঁড়ানো চেকারকে টিকেট দিয়ে দিতে হয়। এই প্রথমবার ট্রেনে চেপেছে তোত্তোচান, টিকেটটি তার কাছে বড্ড মূল্যবান। চেকারকে টিকেট একেবারে দিয়ে দেবার ব্যাপারটি তার কাছে বেদনাদায়ক। তাই সে শক্ত মুঠোয় টিকেট চেপে রেখে চেকারকে অনিচ্ছুক গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি এটা রেখে দিতে পারি?'

'না!' বলেই চেকার তোত্তোচানের হাত থেকে মহার্ঘ টিকেটটি নিয়ে নির্লিপ্তভাবে সেটা ফেলে দিলেন টিকেটে-ভরা একটা বাক্সে। দশাসই একবাক্স ভর্তি লোভনীয় টিকেট! তোত্তোচান বাক্সটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চেকারকে ফের জিজ্ঞেস করল, 'এই সবগুলো টিকেট আপনার বুঝি?'

'নাহ্! এগুলো রেল ইস্টিশনের জন্য রাখা। একটাও আমার নয়।' বলতে বলতে ব্যস্ত চেকার অন্য লোকেদের বাড়িয়ে ধরা টিকেটগুলো অবলীলায় কেড়ে নিয়ে বাক্সটিতে ফেলতে থাকলেন।

'ওহ্!' বাক্সটিকে দুঃখভরে দেখতে দেখতে তোত্তোচান বলল, 'যখন বড়ো হব, আমি নিজেই হব একজন টিকেট চেকার!'

টিকেট চেকার এইবার তোত্তোচানের দিকে ভালো করে তাকালেন। তারপর বললেন, 'বেশ! আমার ছেলেও টিকেট চেকার হতে চায়, তুমি তার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারবে।'

জানালার ধারে তোত্তোচান

আসলে তোত্তোচানের মায়ের মনের ঢিপঢিপানি আর একরাশ দুশ্চিন্তার কারণ হলো অল্প কয়দিন হয় তোত্তোচানকে ইশকুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। অতি আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, প্রথম শ্রেণিতে থাকতেই সে বহিষ্কার হয়েছে!

গত হপ্তার কথা, মাকে ইশকুলে ডেকে পাঠিয়েছিল তোত্তোচানের শিক্ষিকা। সোজাসুজি বলেছিলেন, 'আপনার কন্যাটি ক্লাশরুমের সবকিছুতে বিরক্ত করে। সত্যিই ওর সঙ্গে আমি আর পেরে উঠছি না। দয়া করে ওকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে অন্য ইশকুলে ভর্তি করুন।'

মা অত্যন্ত অবাক হলেন! ছোট্ট তোত্তোচান কী এমন করতে পারে যাতে ক্লাশরুমের সবাই বিরক্ত হয়!

মায়ের প্রশ্নাকুল চোখের সামনে বসে তোত্তোচানের কমবয়সী শিক্ষিকা চোখের পাতা বারবার ফেলতে ফেলতে, ছোট করে ছাঁটা চুলে অত্যন্ত বিচলিত ভঙ্গিতে হাত বুলাতে বুলাতে ঘটনার বিশদ ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন। গলায় তার রাজ্যের হতাশা।

'কী দিয়ে যে শুরু করি!... যেমন ধরুন, সে ক্লাশের পড়া চলাকালীন সময় একশোবারের মতন তার ডেস্ক খোলে আর বন্ধ করে। সত্যি সত্যিই একশোবার! আমি তাকে বলি প্রয়োজন না হলে যেন সে ডেস্ক বারবার না খোলে। তখন আপনার মেয়ে খাতা, পেনসিল, রবার, বই সবকিছু ডেস্কের ভেতর রেখে একটা একটা করে বের করতে থাকে।... আমি যখন 'অ' অক্ষরটি লিখতে বলি তখন আপনার মেয়ে ঢাকনা খুলে খাতা বের করে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে ধপাস করে ঢাকনা বন্ধ করে।

এরপর আবারও ডেস্ক খুলে পেনসিল বের করে। আবার ধপাস শব্দে ঢাকনা বন্ধ করে। তারপর আবার মোছার জন্য রবার বের করে। ফের ধপাস শব্দে ঢাকনা ফেলে দেয়। 'অ' লেখা শেষ হয়ে গেলেই সে তার সব জিনিসপত্র ডেস্কে ঢুকিয়ে ফেলে। আমি যখন 'আ' লিখতে বলি তখন সে ফের একটা একটা করে সব বের করে আর সশব্দে ঢাকনা ফেলে দেয়। এরপরে ফের সব ঢুকিয়ে ফেলে। আবার 'ই' লেখার সময় সে একইভাবে এসবের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। তার এতবার ডেস্ক খোলা আর বন্ধ করা দেখতে দেখতে আমার মাথা ঘুরতে থাকে। কিন্তু অক্ষর লিখতে হলে ওসব বের করা দরকার। তাই আমি ওকে কিছু বলতেও পারি না!

এসব বলার সময় যেন শিক্ষিকা সেসব ফের দেখতে পেয়ে শিউরে ওঠেন। তার আঁখিপল্লব আরও বেশি পিটপিট করতে থাকে!

মা যেন একটু একটু বুঝতে পারলেন কেন তোত্তোচান ডেস্কের ঢাকনা খোলে আর বন্ধ করে! প্রথমদিন ইশকুল থেকে ফিরেই সে খুশি খুশি গলায় বলেছিল যে ইশকুল তার চমৎকার লেগেছে। ডেস্কগুলো বাড়ির ডেস্কের মতন নয়! চমৎকার বাক্সের মতন করে খোলা যায়।

মা যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে ডেস্কের নতুনত্বে মজা পেয়ে তোত্তোচান ডেস্ক খুলছে আর বন্ধ করছে বারবার। অভ্যস্ত হয়ে গেলেই আর সে অমন করবে না। তাই তিনি শিক্ষিকাকে বললেন, 'ঠিক আছে! আমি ওকে এই ব্যাপারে না হয় ভালোমতন বুঝিয়ে বলব।'

কিন্তু শিক্ষিকা চোখ বড় বড় করে বলে উঠলেন, 'না...না...শুধু এইটুকু হলে আমি নিজেই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিতাম ওকে!'

মা একেবারে মিইয়ে গেলেন একথা শুনে।

শিক্ষিকা যেন ভূতের গল্প বলছেন এমন ফিসফিসে গলায় বললেন, 'পড়াতে পড়াতে যখন খেয়াল করি যে সে ডেস্ক দিয়ে কোনো শব্দ করছে না তখন দেখি সে দাঁড়িয়ে আছে। ক্লাশের পুরোটা সময়ই সে দাঁড়িয়ে থাকে।'

মা বিস্ময়ে হতবাক! তবুও কোনোমতে গলায় আওয়াজ ফুটিয়ে বলেন 'দাঁড়িয়ে থাকে? কোথায় দাঁড়িয়ে থাকে?'

নতুন ইশকুল

ইশকুলের ফটকের কাছাকাছি এসে তোত্তোচান থামল। সে ঠিক বুঝতে পারছিল না এ আদৌ ইশকুলের ফটক কিনা! এই সেদিন অব্দি সে যে ইশকুলে পড়ত তার ফটকখানা ছিল মজবুত ইটের থামের আর তাতে বড় বড় অক্ষরে ইশকুলের নাম লেখা ছিল। এই ইশকুলের ফটকে থামের বদলে দুটি গাছের গুঁড়ি! তাও আবার জ্যান্ত গাছের গুঁড়ি! দিব্যি ডালপালা পাতাঅলা ফটকখানা! তোত্তোচান মাকে বলল, 'দ্যাখ মা, ফটকটা দেখছি মাটি থেকে গজিয়েছে! নিশ্চয়ই এটা বাড়তে বাড়তে একদিন বিদ্যুতের খুঁটির চেয়েও উঁচু হয়ে যাবে!'

আসলেই ফটকের খুঁটি বলতে ছিল কেবল দুটি গাছ। তোত্তোচান ঘাড় কাত করল, কারণ গাছের গায়ে ঝোলানো ইশকুলের নামফলকটি বাতাসে হেলে গেছিল।

তোত্তোচান ঘাড় কাত করেই বানান করে করে ফলকে লেখা ইশকুলের নাম পড়তে শুরু করল। 'তো-মো-য়ে-গা-কু-য়ে-ন-বি-দ্যা-ল-য়!'

তারপর মাকে 'তোমোয়ে' অর্থ জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থমকে গেল। কী জানি দেখেছে সে! এমন কিছু একটা যা তার স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল!

ফটকের সামনেই বাগান আর যত্ন করে কেটে রাখা ঝোপঝাড়। তোত্তোচান ঝোপের ফাঁকে মাথা ঢুকিয়ে অবাক চোখে দেখছিল। বিস্মিত চোখে সে তার মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা! ওটা কি সত্যি সত্যি রেলগাড়ি?'

আহ্! দারুণ ইশকুল!

চমক ভাঙলে খুশির একটা চিৎকার দিয়েই রেলগাড়ির দিকে দৌড়োতে শুরু করল তোত্তোচান। প্রাণপণে দৌড় লাগিয়ে মায়ের দিকে ফিরে বলল, 'তাড়াতাড়ি চল! রেলগাড়িতে চড়ি!'

মা আগে বাস্কেটবল খেলোয়াড় ছিলেন। দৌড়োতে ভালোই পারেন তিনি। তাই তোত্তোচান রেলগাড়িতে উঠতে যাবার মুখেই দৌড়ে গিয়ে তার ফ্রক চেপে ধরলেন মা। শক্ত হাতে ধরে রেখে বললেন, 'না! এ হলো ক্লাশঘর! তুমি এখনও ভর্তি হওনি! যদি রেলগাড়িতে চড়তে চাও তাহলে প্রধানশিক্ষকের সঙ্গে ঠিকঠাক কথা বলতে হবে তোমায়। এখন তার সঙ্গেই দেখা হবে। যদি ভালোভাবে কথা বলো তাহলেই তুমি রেলগাড়ি ক্লাশঘরে বসতে পারবে। বুঝেছ?'

এ বড়ই দুঃখের ব্যাপার-স্যাপার যে এখনই রেলগাড়িতে চড়া যাচ্ছে না! তবে সে মায়ের কথা মতন কাজ করবে বলেই ভেবে নিল। তারপর বলল 'হুম!' আর তারপর আরও ব্যস্তভাবে বলল, 'এই ইশকুল আমার অনেক অনেক ভালো লেগেছে!'

মায়ের ইচ্ছে হলো একটা রূঢ় কথা বলতে। তোত্তোচানের এই ইশকুল ভালো লেগেছে কিনা সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হলো প্রধানশিক্ষকের তাকে ভালো লাগে কিনা! কিন্তু তিনি চুপচাপ তোত্তোচানের ফ্রক ছেড়ে দিয়ে তার হাতটি ধরে প্রধানশিক্ষকের ঘরের দিকে চললেন। রেলগাড়ির কামরাগুলো শুনসান। মনে হয় কেবলই প্রথম ঘণ্টার ক্লাশ বসেছে। ছোট খেলার মাঠকে ঘিরে কোনো দেয়াল নেই। আছে সমান করে ছাঁটা ঝোপঝাড়ের বেড়া। এর মাঝে মাঝে লাল হলুদ উজ্জ্বল ফুলে ছোপানো কেয়ারি।

প্রধানশিক্ষক

যখন তোত্তোচান ও তার মা প্রধানশিক্ষকের ঘরে ঢুকল, তখন যে লোকটি ঘরে বসে ছিলেন তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের হাসিমুখে স্বাগত জানালেন।

লোকটির মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। কয়েকটা দাঁতও নেই দেখা গেল। তবে তাঁর চেহারা উজ্জ্বল। বেঁটেখাটোই বলা যায় তাঁকে। তবে তিনি ছিলেন হাসিখুশি সপ্রতিভ। একটা বহু পুরনো হয়ে যাওয়া তিন পিসের সুট সাবলীলভাবেই পরে ছিলেন তিনি।

তোত্তোচান ব্যস্তভাবে বাউ[২] করে তড়িঘড়ি জিজ্ঞেস করে বসল, 'কি প্রধানশিক্ষক, নাকি ইস্টিশনের লোক?'

মা বিব্রত হয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার জন্য মুখ খুলতেই লোকটি তোত্তোচানকে হাসিমুখে উত্তর দিলেন, 'আমি এই ইশকুলের প্রধানশিক্ষক।'

তোত্তোচান অত্যন্ত খুশি হয়ে বলল, 'বাহ! আমি খুবই খুশি! আমি এই ইশকুলে ভর্তি হতে চাই!'

প্রধানশিক্ষক এবারে তোত্তোচানের দিকে একটি চেয়ার এগিয়ে দিলেন। তারপর মায়ের দিকে ঘুরে বললেন, 'আমি এখন তোত্তোচানের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি বাড়ি যেতে পারেন।'

তোত্তোচান যেন একটু বেকায়দা বোধ করল। পরক্ষণেই তার মনে হলো যে প্রধানশিক্ষকের সঙ্গে সে ঠিকঠাকই কথা চালিয়ে যেতে পারবে।

২. জাপানিরা বিনয় প্রকাশ করতে মাথা নুইয়ে সম্ভাষণ জানায়।—অনুবাদক

টিফিনের ঘণ্টা

ইশকুলের ছেলেমেয়েরা যেখানে দুপুরবেলায় টিফিন খায়, প্রধানশিক্ষক মশাই তোত্তোচানকে সেইখানে নিয়ে গেলেন। তারপর বুঝিয়ে বললেন, 'শুধু টিফিনের সময় রেলগাড়ির কামরায় না খেয়ে আমরা সবাই চলে আসি হলঘরে। সেখানেই সবাই একসঙ্গে বসে টিফিন করি।'

তোত্তোচান যে পাথরের সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে পেরিয়েছিল, হলঘরটি ছিল সেই সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার পরে একেবারে শেষ মাথায়। তোত্তোচান দেখল হলঘরে জমায়েত ছেলেমেয়েরা সবাই হৈ হৈ করতে করতে ডেস্ক ও চেয়ার টানাটানি করছে। আসলে তারা বৃত্তাকারে সব চেয়ার আর ডেস্কগুলো সাজাচ্ছিল। তোত্তোচান তখন দাঁড়িয়ে ছিল হলঘরের এক কোণায়। সে প্রধানশিক্ষক মশাইয়ের শার্টের আস্তিন টেনে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'অন্য ছেলেমেয়েরা সব কোথায়?' তিনি উত্তর দিলেন, 'এরাই সব। সব এখানেই আছে।'

'এরাই সবাই? মাত্র এই কয়জন?'

আসলে তোত্তোচানের আগের ইশকুলের একেক ক্লাশেই পঞ্চাশজন করে ছাত্রছাত্রী ছিল। এখানে হলঘরে পুরো ইশকুলের সবাই জমায়েত হলেও মোট সংখ্যা কিছুতেই পঞ্চাশের ওপরে নয়। এই ইশকুলের সবকিছুই ছিল মোটের ওপর বেশ অন্যরকম!

হলঘরে সবাই যার যার চেয়ারে বসে পড়ার পর প্রধানশিক্ষক মশাই সবাইকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, 'সবাই সমুদ্দুরের কিছু আর পাহাড় থেকে কিছু এনেছ?'

শিশুরা সমস্বরে চেঁচিয়ে বলল, 'এনেছি!'